মৃত্যুহীন প্রাণ

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

কমলা বুক ডিপো
কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন—শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫নং বঙ্কিম চ্যাটাৰ্জ্জী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

[প্রথম সংস্করণ, ১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনতা দিবস) ১৯৪৯]

পাঁচ সিকা

উৎসর্গ

শ্রীমান দীপককুমার মিত্র

ও

কুমারী তৃপ্তিরাণী মিত্র

তোমরা যখন বড় হবে, তখনো হয়ত আমি থাকবো, হয়ত' বা থাকবো না, তবু অনুরোধ রইলো, দেশের মুক্তি যজ্ঞে যারা দিল আত্মবলি, তাঁদের ত্যাগ, ত্যাগের নিষ্ঠা, তাঁদের দেশাত্মবোধ যেন তোমাদের আদর্শ হয়। ইতি :

বেঙ্গল পেপার মিল, কোয়ার্টার
রাণীগঞ্জ।

শুভানুধ্যানে
শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

=শোনো মন দিয়ে=

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের দিনে লিখেছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে,
'মৃত্যুহীন প্রাণ,'
মরণে তাহাই তুমি
ক'রে গেলে দান।"

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি কবির সে বাণী সার্থক হয়েছে; মৃত্যুর পরেও অমরত্ব লাভ করেছেন দেশবন্ধু,—বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে; মৃত্যু তাঁকে মুছে দিতে পারেনি, কালের প্রলেপ তাঁর স্মৃতিকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

মৃত্যুহীন প্রাণ উপন্যাসখানিতে দেশভক্ত শহীদ শ্রীমন্ত ও যোগেশ-চন্দ্রের যে কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে, তা' বাঙ্গালীর মর্ম্মের কথা; তাই তা'র সাড়া মিলেছে, সত্যব্রত ও গোলাম মহম্মদের মত বাঙলার অগণিত কিশোর-কিশোরীর হৃদয়ে; তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দনে ধন্য হ'য়েছে,—শিশু-সাহিত্যের যাদুকর প্রভাতকিরণের সস্নেহে দেওয়া নাম, "মৃত্যুহীন প্রাণ", সৃষ্টির সার্থকতার আনন্দে ধন্য হ'য়েছে গ্রন্থকার।

"ভাই-বোনে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়, হাজার কণ্ঠে যে কলধ্বনি উঠেছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বইখানি বাঙলাদেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে সাদরে গ্রহণ করলে প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে। শ্রদ্ধান্বিত অনুসরণ ও আদর্শ-নিষ্ঠাই যেন বাঙলার ছেলেমেয়েদের ব্রত হয়। ইতি:

বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোং লিঃ
রাণীগঞ্জ:
১৫ই আগষ্ট, (স্বাধীনতা দিবস)
১৯৪৯ সাল।

শুভার্থী—
গ্রন্থকার

এক

বন্দীর অবস্থা খারাপ ; রোগশীর্ণ মণিবন্ধটির নীচের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং ওপরের দিকে দু'টি আঙ্গুলের মৃদু চাপ দিয়ে বৃদ্ধ জেলডাক্তার রোগীর নাড়ি পরীক্ষা ক'রছেন, তাঁর নিজের রিষ্ট্-ওয়াচটির সেকেণ্ডের কাঁটার দিকে দৃষ্টি তাঁর স্থির-নিবদ্ধ। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা ঠিকই চ'লেছে, তা'র গতি এতটুকু কমে-বাড়েনি ; সেকেণ্ড থেকে মিনিটে, মিনিট থেকে ঘণ্টায়…ঘণ্টা থেকে দিন, মাস, বৎসরের ওপর তা'র যাত্রাপথ বিস্তৃত ; রোগীর

কিন্তু নাড়ির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অত্যন্ত ক্ষীণ, অস্পষ্ট হয়ে আসছে নাড়ির গতি, তার চলা হয়ত কয়েক ঘণ্টা পরেই চিরতরে থেমে যাবে।

কালরোগঃ মানুষের,—ডাক্তারের শক্তি নেই তা'কে প্রতিরোধ ক'রতে পারে, বাঁচাতে পারে রোগীকে মরণের হাত থেকে ; তাই চারিদিকে উঁচু উঁচু প্রাচীর ঘেরা, লোহার বেড়া দেওয়া জেলের ভেতর বন্দী শ্রীমন্তের জীবনের দীপটি কৈশোরেই নিভে আসছে। রাজবন্দী শ্রীমন্ত ; রোগা, পাতলা লাজুক ছেলেটি এতবড় দুঃসাহসের কাজ ক'রলো কি ক'রে ভাবতে গিয়ে জেল-ডাক্তার অবাক হ'য়ে যান ; আজ প্রায় তিরিশ বছর হ'তে চ'ললো তিনি সরকারের অধীনে চাকরি করছেন জেল-ডাক্তার হিসেবে, ছোটখাট মফঃস্বল সহরের জেলখানা

থেকে সুরু ক'রে আলিপুর, হিজলী, লক্ষ্ণৌ কত বন্দীনিবাসই তিনি ফিরলেন, কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা হ'লো, কত ধরণের কত বিচিত্ররকমের বন্দী দেখলেন জীবনে···চোর, ধূর্ত্ত, গুণ্ডা, বদমাইস, ডাকাত; পেটের দায়ে, ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে খুন খারাপি, চুরি ডাকাতি ক'রে জেলে এসেছে···কারও সাত, কারও আট, কারও ন'বছর, কারও বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'য়েছে; সেদিকে হুঁস নেই, খেয়াল নেই, বেশ আছে,—যেন নিজের বাড়ী, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, হল্লা সবই চ'লেছে; ডাক্তারবাবু এই দেখে আসছিলেন বেশীর ভাগ, হঠাৎ যেন তাল কেটে গেল, চাকা গেল ঘুরে···প্রথমে একটি দু'টি, পরে দলে দলে এক নূতন ধরণের বন্দী জেলে আসতে লাগলো, যা'দের না আছে পেটের ভাবনা, না আছে জামাকাপড়ের ভাবনা, বড় বড় ঘরের ছেলে···সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়, মাথায় খদ্দরের টুপি, সাদা মোটা ধুতি পরণে, পায়ে চটি জুতো, আসতে লাগলো একজনের পর একজন, তা'দের পিছনে পিছনে জেলের গেট পর্য্যন্ত আসতে লাগলো বড় বড় গাড়ী, অগণিত জনতা; ডাক্তারবাবু জেলের অফিস থেকে চোখ তুলে দেখতেন, বিস্ময় জাগতো; চশ্‌মাটা অকারণেই মুছে নিতেন একবার; বাড়ী গিয়ে ব'লতেন—কি রকম খামখেয়ালী লোক দেখ—কী ভাবনা বাবু তোর, অত টাকা অত লোকজন, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় ছেড়ে সখ ক'রে জেলে আসতে সাধ যায় কি ক'রে বল্‌ দেখি?

তাঁর ছেলেটি বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো: বাপের মতই তা'রও মনে হ'তো—হ্যাঁ, তাই ত! সখ ক'রে

জেলে আসে লোক কি সুখে? …জেল, ঘানি…সতরঞ্চি বোনা…প্রেসের মেসিন…ফাঁসির মঞ্চ, সব মনে প'ড়ে যায় ছেলেটির…চিন্তা এসে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলে পড়ে: বইখানা খুলে প'ড়তে সুরু ক'রে দেয় 'লেট্ এ, বি, সি, বি এ ট্রায়্যাঙ্গল!'…

দুই

অদূরে শ্রীমন্তের মা ব'সে আছেন শ্রীমন্তের মাথায় হাত রেখে; হতভাগিনী বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান শ্রীমন্ত; অপলক চোখে মা তাকিয়ে আছেন তাঁর সন্তানের মুখের পানে… তাঁর দুটি চোখে বেদনা ঝরে প'ড়ছে, মুখে কিন্তু স্মিত ম্লান হাসি: কিসের যেন পরিতৃপ্তিতে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, কিসের যেন গৌরব…তিনি আজ হারানোর মধ্যে দিয়ে যেন বড় কিছুর প্রত্যাশা করছেন।

—মা, মা,…ওমা! শুনতে পাচ্ছ না! বিকারের ঝোঁকে একটানা বিলাপ ক'রে চ'লেছে শ্রীমন্ত—এই যে বাবা আমি… এই যে তোর মাথার কাছে ব'সে আছি; মা শ্রীমন্তের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন; পরমূহূর্তেই শ্রীমন্ত কেমন একরকম বিস্ময়-ভরা চোখ মেলে তাকায় চারিদিকে, বলে—ভারতবর্ষ! আমার সোনার ভারতবর্ষ!

ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করেন আবার; একটা পঁচিশ সিসি গ্লুকোজ ইন্‌জেক্‌সনের টিউব ও একটি বড় ছুঁচ বের করেন; তরল গ্লুকোজটি ইন্‌জেক্‌সনের সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে পরীক্ষা করে

দেখলেন একবার, তারপর শ্রীমন্তের রোগশীর্ণ হাতখানিতে শিরা খুঁজতে লাগলেন; কঙ্কালসার পাণ্ডুর দেহ, ডাক্তার একবার হতাশ চোখে মায়ের দিকে তাকালেন,······যেন পাষাণ প্রতিমা!

ইন্‌জেক্‌সনের ছুঁচটি যেন হাড়ের মধ্যেই এফোঁড় ওফোঁড় হ'য়ে গেল; জ্ঞানহীন রোগী এতটুকু যন্ত্রনাকাতর শব্দ পর্য্যন্ত ক'রলো না।

শ্রীমন্তের বড় বড় অগোছালো চুলগুলির ওপর মা আঙ্গুল চালিয়ে হাত বুলোচ্ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা হতাশজনক দেখেই জেলের মধ্যে মাকে আসার অনুমতি দেওয়া হ'য়েছিল। মা যখন এসেছিলেন তখনও জ্ঞান ছিল শ্রীমন্তের; দু'চারটে কথা হ'য়েছিল মায়ের সঙ্গে, তারপর কয়েক বার রক্তবমি করার পর সে নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়েছিল ক্রমশঃ, জ্ঞানও হারিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে; দীর্ঘ কারাবাসের কঠিন পরিশ্রম, অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য ক'রে ক'রে কালব্যাধি ধরে গেল শ্রীমন্তের। প্রথমে খুক্‌খুকে কাশি, সেইসঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর দেখা দিল, দেহ দুর্ব্বল ক্ষীণ হ'য়ে আসতে লাগলো; তারপরই সুরু হ'লো রক্ত ওঠা; কফ ও থুতুর সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত··· যক্ষ্মাকীটে খেয়ে দেওয়া ফুস্‌ফুস্ থেকে রক্তপাত; তার ওপরেই চলেছিল জেলের শাসন, অমানুষিক খাটুনি; বন্দীদের প্রতি, বিশেষ ক'রে রাজবন্দীদের প্রতি বৃটিশ সরকারের আক্রোশের অন্ত ছিল না। তাঁদের মতে এরা বিপ্লবী, শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী!

পোষাকুকুর দেখেছ ত' তোমরা! মুখ বাঁধা থাকে, প্রভুর উচ্ছিষ্টে উদর পূর্ণ করে এবং তার বন্দিত্বের মাঝখানেই প্রভুর প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখায় লেজ নেড়ে।...শাসনকারীরা ভারত-বাসীকে ঠিক তেমনিভাবেই রাখতে চেয়েছিলো; তারা যে একদিন বন্দিত্বের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে পারে, কামড় দিতে পারে, এ ধারণা শাসকদের ছিল না; তাই বিদ্রোহ দমন করার জন্য তারা একের পর এক, পরে দলে দলে দেশ-ভক্তকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখতে সুরু করলো।

স্বাধীনতা,...মানুষ হ'য়ে মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকারকে তারা রাজদ্রোহ আখ্যা দিলো; উনিশ বছরের তরুণ শ্রীমন্ত, এই ধরণের বন্দী রাজদ্রোহী সে; তাই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পরও সে মুক্তি পেলে না কারাগার থেকে; সরকার তা'র চিরমুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ডাক্তারের মনে পড়ে, তিনি ছ'মাস আগে শ্রীমন্তকে মুক্তি দেবার সুপারিশ করেছিলেন গভর্ণমেন্টের কাছে; ওদিক থেকে কোনও সাড়া মেলেনি।

তিন

মরণোন্মুখ সন্তানের শিয়রে ব'সে মায়ের মনে প'ড়েছে শ্রীমন্তের একুশ বছরের জীবনের খুঁটিনাটি, আদর আব্দার, দুরন্তপনা।...আঁতুড় থেকে সুরু ক'রে জেলখানা পর্য্যন্ত তাঁর স্মরণের পথ বিস্তৃত হ'য়ে গেছে।...শ্রীমন্ত যখন জন্মেছিল, মা তখন অসুস্থ; রোগজীর্ণ মায়ের রুগ্ন পুত্র শ্রীমন্ত ভূমিষ্ঠ হ'য়ে

কাঁদেনি পর্য্যন্ত, সবাই ভেবেছিল মরা ছেলে প্রসব ক'রেছেন হৈমবতী ; বৃদ্ধা দাই কিন্তু দমেনি ; হ'ক সে অশিক্ষিতা গ্রাম্য ছোট ঘরের মেয়ে, তবু তা'দেরও ভগবান্ আছেন, অস্পৃশ্যের ভগবান্, তথাকথিত নীচজাতির ভগবান্ ; তাই দাই কঠিন শপথ ক'রে আশ্বাস দিয়েছিল—এই আমি দিব্যি ক'রে বলছি মা, আমার হাতের ছেলে যদি মরা ছেলে হয়, তবে ভগবান মিথ্যে !

গরম লাল একটা তাওয়ার ওপর ফুলের ঝিল্লিটা ঠেকিয়েছিল দাই, সঙ্গে সঙ্গে শিশু কেঁদে উঠেছিল ; মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল ; কানের থেকে সোনার ফুল দুটি খুলে দাইকে দিয়েছিলেন ; পরদিনই শ্রীমন্তের বাবার নাকি কয়েক টাকা মাইনে বেড়েছিল ; বাড়ীর সকলে ব'লেছিল এই নিয়ে—পয়মন্ত ছেলে হ'য়েছে তোর হৈম ; তোদের দুঃখ এবার ঘুচবে ; ওর নাম রাখ শ্রীমন্ত। সেই দিন থেকেই শিশুর নামকরণ হ'য়েছিল শ্রীমন্ত। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল, ফরসা রং, আয়ত দু'টি ভাসা ভাসা চোখ···শীর্ণ শিশু শ্রীমন্তের মুখখানা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে মায়ের ; দুধটুকু পর্য্যন্ত গিলতে কষ্ট হ'তো যেন ছেলের ! নেক্ড়ার পলতেয় ক'রে এক দেড়মাস তা'কে দুধ খাইয়েছিলেন মা ;—মা, মাগো ! সব রক্তে রাঙা হ'য়ে গেল মা !

বাবা ! মাণিক ! কোথায় রক্ত ? এই যে আমি তোর পাশে ব'সে আছি !

—না, না আমাকে মের' না তোমরা, আমার নখে ছুঁচ

ফুটিয়ো না অমন ক'রে। ওদের কারুকেই আমি চিনি না; সুর বদলে আবার বিকারের ঝোঁকে বলে—চেনো না! সব চেনো তুমি! বলতেই হবে তোমাকে!—উঃ মাগো! এর পর কণ্ঠস্বর দৃঢ় হ'য়ে ওঠে রোগীর—না, আমি ব'লবো না।

ডাক্তার আগিয়ে আসেন;—আইস্ ব্যাগটা মাথায় দিন ত রোগীর! বিকার কিনা, ভুল ব'কছে!

—ভুল! ম্লান ব্যাথাক্লিষ্ট হাসিতে হৈমবতীর মুখখানা অপূর্ব্ব দেখায়। আইস্ ব্যাগটা শ্রীমন্তের মাথার ওপর দিয়ে ভাবতে থাকেন মা।

চার

জেলডাক্তারের সেই ছেলেটিও আজ অনেক বড় হ'য়ে উঠেছে; শ্রীমন্তেরই প্রায় সমবয়সী সে; রাজবন্দীদের দেখে আজ তা'র বিস্ময় জাগে না, নিজের স্বার্থ ও গণস্বার্থ অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থের পার্থক্য সে বোঝে আজকাল: তাই তা'র চোখে শ্রীমন্তের মত রাজবন্দীরা আর শুধু কৌতূহলের জিনিষ নয়—দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, সমাজের কল্যাণের পক্ষে এদের প্রয়োজনীয়তা সে মনে মনে উপলব্ধি করে; তাই বন্দী শ্রীমন্তের অবস্থা আশঙ্কাজনক, বাপের কাছ থেকে এই খবর পেয়ে শ্রীমন্তকে দেখতে চ'লে আসে জেলের ভেতর; জেলডাক্তার ইন্‌জেকসনের সিরিঞ্জে ক্যালসিয়াম ভরছিলেন, হঠাৎ ছেলেকে সেখানে দেখে তাঁর হাত কেঁপে গেল; সরকারী চাকুরে;—জেলডাক্তারের ছেলে এসেছে রাজবন্দীকে দেখতে!

কম্পমান হাত থেকে খানিকটা ক্যালসিয়াম পড়ে গেল, পুরু চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকলেন তিনি; কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লো না তাঁর: তারপরে ব'ললেন—তুমি, তুমি এখানে কেন?

শ্রীমন্তদাকে দেখতে! বেশ ধীর কণ্ঠে জবাব দিলে ছেলেটি।

—শ্রীমন্তদাকে দেখার লোকের অভাব নেই; সরকার, পুলিশ থেকে সুরু ক'রে আমি পর্য্যন্ত তা'কে দেখছি!

—লোকের মতন লোক তাকে দেখার নেই বাবা, এক আছেন মা,...আর এক আছেন আপনি, ডাক্তার; রোগীর জীবনমরণ আপনার ওপর নির্ভর করছে,...কিন্তু আপনিও হুকুমের চাকর; আপনাকে যদি বিষ দিতে বলে, আপনি তাই দেবেন!

—কি ব'ললে? কি ব'ললে তুমি আমার মুখের ওপর? বেয়াদপ ছেলে! বাপের মুখের ওপর কথা ব'লতে লজ্জা করে না তোমার!

—অন্যায়, অধর্ম্ম আমার পক্ষে যতটুকু, রাজার পক্ষে ততটুকু, একথাটা ভুলে যাবেন না বাবা!

রাগে অপমানে কাঁপতে লাগলেন ডাক্তার: চীৎকার ক'রে উঠলেন—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে! কে তোমাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে?

মা ধীরে ধীরে উঠে এলেন শ্রীমন্তের শিয়র থেকে: জেল-ডাক্তারের ছেলের কাছে আগিয়ে এসে সস্নেহে কাঁধে হাত রাখলেন, ব'ললেন—ছিঃ বাবা, গুরুজনের সঙ্গে ওরকম ক'রে

কথা ব'লতে নেই ; ওঁরা যা' করেন, তোমাদের ভা'লর জন্যে, তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বলেন। জগতে বড় কাজ করতে গেলে, বড় হ'তে হলে এই কথাটি মনে রেখো বাবা ; যাঁরা শ্রদ্ধেয়, যাঁরা নমস্য, তাঁদের নির্দ্দেশ, তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধ'রে চলতে হয়।

এতক্ষণে দর্‌দর্‌ ক'রে কেঁদে ফেললে ছেলেটি : কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, আমি শ্রীমন্তদাকে দেখতে এসেছিলাম,...এতে আমি কি দোষ করেছি বলুন ?

হৈমবতী হাসলেন ! তোমার আমার চোখে যা' দোষ নয়, তোমার বাবার চোখে তাই হয়ত অন্যায় ব'লে মনে হ'য়েছে, তাই তিনি তোমাকে ব'কেছেন।

—কিন্তু মাসিমা ! উনি কি জানেন না কিসের লোভে, কি প্রেরণা পেয়ে দেশের ছেলেরা দলে দলে জেল ভর্ত্তি করছে, বিপ্লব সৃষ্টি ক'রছে, বোমা তৈরী করছে ; উনি কি জানেন না এই তরুণদের কাছে দেশের প্রত্যেক মানুষের ঋণ কতখানি !.... আবেগ-ভরাকণ্ঠে ব'ললে ছেলেটি।

—জানেন বাবা, সবই জানেন, কিন্তু নিরুপায় ; পেটের দায়ে কেউ চুরি করে, কেউ ডাকাতি করে, কেউ খুন করে, আবার পেটের দায়েই কেউ মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে চাকরি করে, ...আমার ছেলে হ'লেও শ্রীমন্ত রাজদ্রোহী ; তার সঙ্গে তুমি মেলামেশা ক'রলে, ঘনিষ্ঠতা ক'রলে তোমার বাবার চাকরি বিপন্ন হবে।

শ্রীমন্ত বিকারের ঘোরে চারিদিকে তাকিয়ে কাকে যেন

খুঁজছিল : মা আগিয়ে এসে তা'র মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়লেন : ডাকলেন—শ্রীমন্ত ! বাবা আমার ! কিছু ব'লছ ?

শ্রীমন্ত শুধু অস্ফুটস্বরে ব'ললে—অ্যাঁ !

পাঁচ

ছেলেটি এসে শ্রীমন্তের শিয়রে মায়ের পায়ের কাছে ব'সলো : হৈমবতী তা'কে হাত ধ'রে উঠালেন : ব'ললেন—না বাবা ওখানে ব'সোনা : রোগটা খারাপ, এর জীবাণু বড় সংক্রামক !

—আপনি তবে কি ক'রে দিনের পর দিন ব'সে আছেন মাসিমা ?

হৈমবতী ম্লান হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন—ওরে পাগল ছেলে, আমি যে মা ! আমি কি প্রাণের ভয়ে আজ ওকে দূরে ফেলে থাকতে পারি !···কিন্তু, কি নামটি বাবা তোমার ?

—আমার নাম সত্যব্রত !

—ভালো নাম, সুন্দর নাম : ...নামের যোগ্যতা তুমি রক্ষা করো, এই আশীর্ব্বাদই তোমাকে করছি বাবা !

জেলডাক্তার সিরিঞ্জ ঠিক ক'রে আগিয়ে এলেন ইন্‌জেকসন দেওয়ার জন্যে : ভ্রূকুটিকুটিল চোখে তাকালেন সত্যব্রতের দিকে ; হৈমবতীকে ব'ললেন—দেখলেন আপনি নিজের চোখে, এ ছেলের আমি কী ভরসা করতে পারি বলুন ত' ; একেবারে ব'য়ে গেছে...গুরুজনের কথা মানে না, সে ছেলে বেঁচে থেকে লাভ কী বলুন ত' ?

—ডাক্তার বাবু। যুগ পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে; আমরা যারা একভাবে জীবনের দীর্ঘ দিন কাটিয়ে এসেছি, তারা ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট, হুল্লোড়, বিপ্লবে যোগ দিতে ভয় পাই; কিন্তু নতুন মানুষ এই ছেলেরা যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এরা পৃথিবীতে এসেছে, তাই এদের সময়কার চিন্তার ও কাজের ধারা আমাদের সময় দিয়ে বিচার ক'রলে চ'লবে না!

ডাক্তার বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন; মরণোন্মুখ সন্তানের শিয়রে ব'সে মায়ের এই অপরূপ বাণী তাঁকে বিচলিত করে, অভিভূত ক'রে দেয়।

হৈমবতী একটু থেমে বলেন—আপনি বাল মৃদুকণ্ঠে জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে ব'লেছিলেন আমার শ্রীমন্ত বাঁচবে না.... মায়ের গলা ধরে এলো :—কিন্তু আমি তা'তে এতটুকু বিচলিত হইনি কেন জানেন, আমার শ্রীমন্ত আজ ঘরে ঘরে সত্যব্রতের মত হাজার হাজার ছেলেকে রেখে যাচ্ছে; আমি তা'দের নিয়ে ভুলে থাকতে পারবো ডাক্তার বাবু!

ডাক্তারের হাত কাঁপতে লাগলো; তিনি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ ভুলে গেলেন: হাত থেকে ইনজেকসনের সিরিঞ্জটা পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।

—মরফিয়া! এ অবস্থায় মরফিয়া দেওয়া মানে রোগীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটানো: একথা জানিয়েছিলেন উনি: তবু কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ এসেছিল, আজ মরফিয়াই তাঁকে দিতে হবে।

ডাক্তার হঠাৎ একটু বিচলিত হ'লেন; ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী করলেন, কয়েকবার রোগীর শীর্ণ হাতখানি তুলে নিয়ে

নাড়ি পরীক্ষা ক'রলেন ঃ তার পর হঠাৎ দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

সত্যব্রত উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর ইন্‌জেক্‌সনের খালি টিউবটার লেবেল প'ড়ে শিউরে উঠলো—মরফিয়া!

ছন্ন

হৈমবতী সত্যব্রতকে অনেক বোঝালেন ঃ মাত্র আঠারো বছর বয়স তা'র, সরকারী চাকুরের ছেলে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি মেলে ধরলেন তার চোখের সামনে; তা'কে ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রলেন ঃ সত্যব্রত কিন্তু অচল, অটল হয়ে ব'সে থাকলো, দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললে—তা' হয় না মাসিমা, আর আমি ফিরতে পারি না ঃ আপনি জানেন না—রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কী গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে ঃ কারুকে বিশ্বাস করবেন না, আমার বাবাকে পর্য্যন্ত না; নিজে হাতে ওষুধ খাওয়াবেন, ইন্‌জেক্‌সনের ওষুধ পরীক্ষা ক'রে তবে ইন্‌জেক্‌সন করতে দেবেন; আমরা মায়ে ছেলেয় শ্রীমন্ত-দাকে বাঁচাবো!

মা যেন এতক্ষণে কিছু বুঝতে পারলেন; সস্নেহে সত্যব্রতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—মানুষের জন্য যদি তোমার মন এমনি ক'রে কাঁদে, তবে মানুষের ভগবানই তোমার মঙ্গল করবেন বাবা!

—শ্রীমন্ত-দা কী করেছিলেন যার জন্যে তিনি হলেন রাজদ্রোহী?

যুদ্ধের সময় মানুষের মুখের গ্রাসের ধান, চাল ছিনিয়ে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট যখন সরকারী গোলা বোঝাই করছিলো বিদেশের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্যদের পাঠাবার জন্যে, তখন শ্রীমন্ত তা'র দলবল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচারকার্য্য চালিয়েছিল, মানুষকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছিল—নিষেধ করেছিল টাকার লোভে মুখের গ্রাসকে বিক্রয় না ক'রে!

—আর?

—আর শুনেছি তা'রা নাকি বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে সাম্রাজ্য-বাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল: তখন তা'র বয়স মাত্র আঠারো বছর!

সত্যব্রত বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলো; তা'র কানে মায়ের একটা কথা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগলো—তখন তার বয়স আঠারো বছর!....বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, আঠারো বছর বয়সে মায়ের স্নেহের ডোর ছিঁড়ে জেলে আসতে পেরেছে! মরণকে বরণ করতে চলেছে, আর সে জেল-ডাক্তারের পাঁচ ছেলের মধ্যে একজন হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, ভালমানুষ সেজে অন্যায়কে অন্যায় বলবে না, অসত্যকে অসত্য বলবে না, অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ক'রবে না, তবে কি তরুণদের উদ্দেশ ক'রে বিশ্বকবি মিথ্যেই ব'লে গেছেন—ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

ওরে, আমার কাঁচা:
আধমরাদের ঘা' মেরে তুই বাঁচা!

নির্য্যাতীত, নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার নির্দ্দেশই ত' দিয়ে গেছেন কবি!

মা ডাকলেন—সত্যব্রত! কি ভাবছ' বাবা!

—ভাবছি, শ্রীমন্ত-দাকে যদি বাঁচাতে পারি: আমরা দু'ভাইয়ে আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ল'ড়বো!

—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কামনা পূর্ণ হ'ক বাবা!

সাত

…শ্রীমন্তের সেবা করার জন্যে আবেদন জানিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিল সত্যব্রত: মা একা সামলাতে পারছে না রোগীকে, আর একজন থাকার দরকার একথাও লিখেছিল, সেই সঙ্গে তাঁর চিকিৎসার ও পরিচর্য্যার ক্রুটি, এবং সরকারের হৃদয়হীনতার উল্লেখ করতেও ভোলেনি।

সরকারপক্ষ অনুমতি ত দেয়ইনি, উপরন্তু জেল-ডাক্তারের নামে ভয় প্রদর্শন ক'রে এক চিঠি দিয়েছিলো তাঁর ছেলের ওপর নজর রাখবার জন্যে। চিঠি পেয়েই ডাক্তার ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে উঠলেন; খালি গায়ে চটি প'রে দ্রুতপদে সত্যব্রতের ঘরে এসে ঢুকলেন; সে তখন "বিপ্লবের ইতিহাস" নিবিষ্ট মনে প'ড়ছে: বাপের চটির শব্দ তা'র কানেই পৌঁছেনি; ডাক্তার বইখানা দেখে নিলেন একবার, ছোঁ মেরে তুলে নিলেন সেখানা টেবিলের ওপর থেকে, কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন পাতাগুলি, তারপর পায়ের চটি খুলে সত্যব্রতের পিঠে মুখে যথেচ্ছভাবে মারতে সুরু ক'রলেন: আশ্চর্য্য, সত্যব্রত এতটুকু

কাঁদলো না বা বেদনাসূচক শব্দ করলো না, নীরবে পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে বইখানির ছেঁড়া পাতাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলো : তার চোখের সামনে ছবি ভাসছিল—শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ফাঁসীর মঞ্চ ও রিভলভারের গুলীতে আত্মদান, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কংগ্রেস গঠন...মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, দলে দলে দেশভক্তদের কারাবরণ, নির্য্যাতন-অপমানের মাঝখানে অবিচলিত নিষ্ঠার সহজ দেশাত্মবোধ!

রাগে ফুলতে ফুলতে ডাক্তার সরকারী খামখানা ছুঁড়ে দিলেন সত্যব্রতের মুখের ওপর—কি এসব? এসব করতে তুমি শিখলে কোথা থেকে? বাপের চাকরিটি গেলে খাবে কি? দাঁড়াবে কোথায় শুনি? দু'পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই! বাপের অন্ন ধ্বংস ক'রছ আর দেশভক্ত হয়ে নাম কেনবার ফন্দী আঁটছো! ডেঁপো, বদমাইস ছেলে কোথাকার!

তার বাবা বেরিয়ে যেতেই সত্যব্রত চিঠি দু'খানা তুলে পড়লে : একখানা তা'র আর একখানা বাবার নামের চিঠি : কর্ত্তৃপক্ষ তা'কে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে রাজবন্দী শ্রীমন্তের মা ভিন্ন অপর কেউ তাঁর কাছে থাকার ও সেবাশুশ্রূষা করার অনুমতি পাবে না; আর একখানাতে তার পিতাকে ভয়প্রদর্শন ক'রে ছেলেকে শাসনে ও বশে রাখার নির্দ্দেশ এসেছে সরকার থেকে। সত্যব্রত স্থির মনে ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর ছোট একটি সুটকেশে দু'একখানা জামা-কাপড় নিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কারুকে না জানিয়ে।

আট

তার এক সহপাঠী এস-ডি-ওর ছেলের কথা মনে হলো তার ; শিবপদ তা'কে এ সম্বন্ধে কিছু সাহায্য হয়ত করতে পারে ; শিবপদর বাবা নাকি সম্প্রতি গভর্ণরের সেক্রেটারী হ'য়েছেন এ সংবাদ শুনেছিল সে ; শিবপদর সঙ্গে চিঠিপত্রেরও আদান প্রদান ছিল তার মধ্যে মধ্যে। ক'লকাতায় এসে এক হোটেলে উঠে শিবপদর বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো সত্যব্রত ঃ তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানালো তা'কে ; মরণোন্মুখ মুমূর্ষু শ্রীমন্তের সেবাশুশ্রূষার জন্যে তা'র কাছে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্যে তার বাবাকে অনুরোধ করতে বললে শিবপদকে। তারপর কয়েকদিন ধ'রে শিবপদর বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি ক'রে যখন প্রায় সে হতাশ হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক এমনি সময় বিরক্ত হ'য়ে সত্যব্রতকে তাঁর ছেলের সান্নিধ্য থেকে সরানোর জন্যেই যেন তিনি অনুমতিপত্র দিলেন সত্যব্রতকে ঃ কিন্তু এতেই যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল সে ; শিবপদদের বাড়ী থেকে সোজা হোটেলে ফিরে সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে সে ষ্টেশনের উদ্দেশে বাসে চ'ড়ে বসলো ঃ তার মানে একসঙ্গে আশঙ্কা ও উন্মাদনা খেলা করছিল ঃ এ ক'দিন শ্রীমন্তের কোনও খবরই সে পায়নি ঃ তা'কে গিয়ে কি অবস্থায় দেখবে, এখনো সে বেঁচে আছে কিনা এই আশঙ্কায় সে ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হ'য়ে উঠতে লাগলো।

জেলের গেটে এসে গেটের সংলগ্ন জেলারের ঘরে ঢুকে সে অনুমতিপত্র দাখিল করতেই জেলার তার আপাদমস্তক ভালভাবে

নিরীক্ষণ ক'রে নিলে একবার ঃ সত্যব্রতকে বহুবার দেখেছে, চেনেও ভাল ক'রে, ত'াদের পরিবারের সঙ্গে জেলারের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে; তবু পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য বজায়

চিঠিখানা দেখুন

রেখেই ব'ললে—তুমি কি ধন্বন্তরী নাকি হে ছোকরা, যে জেলের ভেতরে গিয়েই হাত বুলিয়ে শ্রীমন্তর যক্ষ্মা সারিয়ে দিতে পারবে?

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সত্যব্রত: যাক্, শ্রীমন্ত এখনো বেঁচে আছে তাহ'লে! একটু থেমে সে ব'ললে—তা'র মতন ছেলের অকালমৃত্যু, দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এইটুকু ভেবেই তাকে সেবাশুশ্রূষা ক'রেই বাঁচিয়ে তুলবো স্থির করেছি।

—তারপর দু'বন্ধুতে মিলে বোমা তৈরী ক'রে জেল খাটতে আসবে, লোকে ফুলের মালা দেবে, কত নাম যশ হবে...কি ব'ল! বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জেলার ব'ললে।

—নাম একটু হবে বৈকি! এতক্ষণে বেশ রূঢ় কণ্ঠেই সত্যব্রত ব'ললে—নাম ত' সরকার বাহাদুর দিয়েই রেখেছে রাজদ্রোহী! বিপ্লবী! এবং তাদের তদারক শাসন ও নির্য্যাতন করার জন্যে ভাত কাপড় দিয়ে আপনাদের পুষছে!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে রেগে উঠতে গেল জেলার; হেসে সত্যব্রত বললে থাক্, কষ্ট ক'রে উঠতে হবে না আপনাকে...ঐ চিঠিখানা দেখুন: আপনার অনেক অনেক পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকের চিঠি ... তাঁর আদেশ পালিত হবে কিনা জানতে চাই।

জেলারের মুখের ভাব মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল, ম্লান হেসে ব'ললে—তোমরা, আজকালকার ছেলেরা বড্ড অল্পতে গরম হ'য়ে পড়ো: তোমার সঙ্গে একটু রহস্য করছিলাম বৈ ত নয়। পরে একজন রক্ষীকে সত্যব্রতকে জেলের ভেতরে শ্রীমন্তের কাছে নিয়ে যেতে বললে।

নয়

মা শ্রীমন্তের শিয়রে তেমনিভাবেই ব'সে আছেন; জ্ঞান ফিরে এসেছে শ্রীমন্তের, উদাস চোখে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে; চোখের কোলে কালীর রেখা...গায়ের রং ফ্যাকাসে; হাত, পা আঙ্গুলগুলি রুগ্ন ক্ষীণ, যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। সত্যব্রত ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে তাকালো শ্রীমন্ত, আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে মায়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। মা বললেন—হ্যাঁ, এই ছেলেটিই সত্যব্রত। ডাক্তারবাবুর ছেলে! তুমি বাবার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে কয়েকদিন কোথায় চ'লে গিয়েছিলে বাবা?

—রাগারাগি ক'রে ত' যাইনি তিনি বেদম মেরেছিলেন আমাকে....আমি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিনি তোমার কথা ভেবে ...ওঁরা গুরুজন যা' বলেন, যা' করেন আমাদের ভালোর জন্যেই করেন।

—তবে রাগ ক'রে ত যাইনি: শ্রীমন্তদার কাছে জেলের ভেতর থেকে সেবা-শুশ্রূষা করার অনুমতি যখন এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট দিলে না, তখন কলকাতায় লাটসাহেবের সেক্রেটারীকে ধরে অনুমতি পত্র আনতে হ'লো আমাকে, এই দেখুন চিঠি!

মা বিস্ময় ও স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে থাকলেন সত্যব্রতের দিকে, বললেন—তাইত বলি সত্যব্রত আমার তেমন ছেলে নয়...অন্যায়ের প্রতিবাদে সে অন্যায় করবে না; বড় ভাল ছেলে, বড় লক্ষ্মী ছেলে, জানিস্ শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত ঘাড় নাড়লো।

তুই ভাল হয়ে যাবি তারপর তোর সঙ্গে মিলে দেশের কাজ করবে এই ওর ইচ্ছে: ওরও বয়েস এই সবে আঠারো; তুইও ঐ বয়সেই বাঁধন ছিঁড়েছিলি, বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলি!

শ্রীমন্ত একভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ তারপর ব'লল—আচ্ছা মা, যেদিন আমি প্রথম দেশের ডাকে সাড়া দি, সেদিনকার কথা মনে পড়ে তোমার?

—তা' পড়ে না আবার? সব পড়ে!···আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন; বৃষ্টি আর বজ্রপাতের বিরাম ছিল না। সোঁ সোঁ ক'রে একটানা ঝড়ের শব্দ হ'চ্ছিল; তুই জওহরলালের আত্মজীবনীখানা প'ড়তে প'ড়তে উঠে এলি, বললি—এঁরা কত বড় ত্যাগী দেখেছ মা! কোটি কোটি টাকার মালিক, বিলাসে, আমোদে স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন অনায়াসে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছেন: জীবন মন উৎসর্গ ক'রেছেন; কারাগারের অশেষ ক্লেশ ভোগ করেছেন।

—তারপর?

—দিনকয়েক গভীরভাবে কি যেন ভাবতে লাগলি তুই: আমার মন কেমন যেন ক'রে উঠলো; দুঃখিনী মা আমি, তুই আমার একমাত্র ভরসা; হঠাৎ একদিন একখানা খবরের কাগজ হাতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালি তুই: তোর চেহারা দেখে ভয় হ'য়েছিল আমার: তুই বললি—না, মা, এরকম নির্য্যাতন অত্যাচার আর মুখ বুজে সহ্য করতে

পারবো না : আমি আন্দোলনে যোগ দেবো ; কংগ্রেস প্রসেশনে অহিংস সত্যাগ্রহীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে এলাহাবাদে, চল্লিশজন নিহত ও আহত হ'য়েছে! আমি বলেছিলাম, তুই একা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবি কেন বাবা !··· একা নয় মা, সমস্ত দেশ জেগে উঠবে, তাড়া খেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, দেখে নিও তুমি ! বলেছিলি তুই।

—তার কয়েদিন পরেই তুই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলি : অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলি।

দশ

···জেলের ভেতরের গাছটা রক্ত করবীতে ছেয়ে গেছে : মানুষের টাটকা তাজা রক্তের মত লাল রং তার ; কতকগুলি ফুল তুলে নিয়ে এলো সত্যব্রত ; মা উঠে গেছেন স্নান করতে, ধীরে ধীরে সত্যব্রত এগিয়ে এলো শ্রীমন্তের বিছানার কাছে ; নিস্তব্ধ নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ে আছে শ্রীমন্ত··· চোখ দু'টি আধবোজা, যেন কিসের ধ্যান ক'রছে সে : আস্তে আস্তে ডাকলো সত্যব্রত— ঘুমুচ্ছ শ্রীমন্ত-দা !

—তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'বার সুযোগ পাইনি : কেবল তোমার মায়ের ও তোমার কথা থেকে তোমাকে চিনতে চেষ্টা করছিলাম : বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, তুমি কত বড় !

—ছিঃ ভাই ওকথা বোল না ; আমরা কত ছোট, কতটুকু ত্যাগ আমাদের ! দেশ-নেতাদের দিকে তাকাও মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এঁদের ত্যাগ, এঁদের পায়ের

রেখা ধ'রে আমরা আমাদের অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছুতে পারবো। এইটুকু কথা বলার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল শ্রীমন্ত: কথাক'টি ব'লেই সে হাঁফাতে লাগলো: বুকটা দুলে দুলে ফুলে উঠতে লাগলো, একটা জোর কাসির ধমক এলো; বুকটা চেপে ধ'রে উঠতে চেষ্টা ক'রলো শ্রীমন্ত, সত্যব্রত তা'কে শুইয়ে দিয়ে আগিয়ে দিলে পিকদানটি··একচাপ রক্ত উঠলো শ্রীমন্তের ·· চোখ দু'টি বেদনায় জলে ভ'রে উঠলো।

·· সত্যব্রত মুছে দিলে শ্রীমন্তের চোখের জল; ব'ললে—তুমি বীর, তুমি যোদ্ধা···তুমি দেশের সুসন্তান! টেবিলের ওপর থেকে একগুচ্ছ রক্তকরবী নিয়ে এলো সত্যব্রত, ব'ললে—তাই রক্তকরবী নিয়ে তোমার সঙ্গে মিতালী করি,···তোমার ত্যাগ, তোমার নিষ্ঠা, তোমার দেশাত্মবোধ আমার আদর্শ হ'ক···

এমন সময় সদ্যস্নাতা শুভ্রথান পরিহিতা মা এসে ঘরে ঢুকলেন, একরাশ কালো চুল পিঠে ফেলে: যেন দেশমাতা অবতীর্ণ হ'লেন বন্দীর দুঃখে অভিভূতা হ'য়ে।

—আবার রক্ত উঠলো মা! ক্ষীণকণ্ঠে ব'ললে শ্রীমন্ত···

আবার উঠলো! দু'তিন দিন ত' ওঠেনি,···অ্যা! মায়ের কণ্ঠে বেদনা ও আশঙ্কা ধ্বনিত হ'লো।

এমনি সময়ে জেলডাক্তার হেলতে দু'লতে এসে ঢুকলেন: বেঁটে খাটো নাদুস নুদুস মানুষটি: চোখে পুরু কাঁচের চশমা: সত্যব্রতকে পুনরায় সেখানে দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমনিভাবে চশমাটা খুললেন একবার, আবার প'রলেন,···তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর চীৎকার ক'রে

উঠলেন—অঁ্যা! আবার তুমি এখানে এসে জুটলে কি ক'রে!··· কে ঢুকতে দিয়েছে তোমাকে এখানে!...বেরোও! বেরোও!

—ছাড়পত্র আছে আমার স্বয়ং গভর্ণরের সই করা!

—ছাড়পত্র! গভর্ণরের সই করা! কেটে কেটে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন তিনি। সত্যব্রত তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে মেলে ধরলো···গভর্ণরের শিলমোহর দেওয়া চিঠি!

এতক্ষণে যেন আকাশ থেকে প'ড়লেন জেলডাক্তার:—তুই! সত্যব্রত, জেলডাক্তারের ছেলে হ'য়ে স্বয়ং গভর্ণরের কাছে গিয়েছিলি?·· অঁ্যা! আশ্চর্য্য!

এগার

...জেলের ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ক'রে; কয়েদী ও বন্দীদের বন্ধ করার ঘণ্টা। সারাদিন অমানুষিক খাটুনির পর ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় রাত্রি যাপন করতে হবে তা'দের: সন্ধ্যার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে! শ্রীমন্তের শিয়রে ব'সে আছেন মা, তাঁ'র কোলের কাছে ব'সে আছে সত্যব্রত একখানি হাত ধ'রে...জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখণ্ড আকাশ, অস্তমিত সূর্য্যের শেষরশ্মিতে তার রং লাল।

—সত্যব্রত! ধীর ক্লান্তকণ্ঠে ডাকলো শ্রীমন্ত।

—কিছু ব'লবে শ্রীমন্ত-দা?

—হ্যাঁ ভাই; আমার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে: আমি জানি আমি বাঁচবো না: মরছি এর জন্যে দুঃখ নেই. শুধু দুঃখ এই

কাজ শেষ ক'রে যেতে পারলাম না!...তোমাকে একটা কথা ব'লে যাবো—রাখবে সত্যব্রত ?

—বলো : আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার প্রাণের বিনিময়েও যদি সম্ভব হয়, তোমার আদেশ পালন ক'রব !

—আদেশ নয় সত্যব্রত : আদেশ করার মতন স্পর্দ্ধা, অত বড় শক্তি আমি রাখি না : তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছ, তাই আমার শেষ অনুরোধ,...আমার মাকে দেখো : আর একটি অনুরোধ, যেখানে দেখবে অন্যায়, অত্যাচার, নির্য্যাতন, সেখানে বুক পেতে দাঁড়িয়ো ;...জোরে জোরে নিঃশ্বাস প'ড়তে লাগলো শ্রীমন্তের ; মা তা'র বুকে হাত রাখলেন, কয়েকফোঁটা জল অসতর্ক মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের মাথার ওপরেই ঝ'রে প'ড়লো ; মা ব'ললেন—একসঙ্গে অত কথা ব'লোনা বাবা, ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন।

—আর আমাকে বারণ ক'রোনা মা ; যা বলার আছে ব'লে নিই : নইলে হয়ত চিরতরে না-বলা থেকে যাবে : শোনো সত্যব্রত, যাঁরা বলেন, রাজনীতি ছাত্রদের জন্যে নয়, তরুণ ও কিশোরদের জন্যে নয়,—তাঁরা ভ্রান্ত। বয়স্কদের হয়ত অভিজ্ঞতা বেশী থাকতে পারে, ধৈর্য্য বেশী থাকতে পারে, কিন্তু সজীব তাজা প্রাণ, টগ্‌বগে রক্ত আছে তরুণের দেহে ও মনে : দেশের কাজে, দেশের স্বার্থের জন্যে যেদিন দলে দলে কিশোররা প্রাণ দিতে পারবে, গুলির সামনে বুক পেতে দিতে পারবে...সেইদিন স্বাধীনতা জয়যুক্ত হবে।...আমার কথা তুমি মনে প্রাণে বিশ্বাস কর সত্যব্রত ?

—হ্যাঁ, একথা খুবই সত্য।

—তবে একথা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না : জগতে যা' কিছু বড় কাজ, শৃঙ্খলার সূত্রে বাঁধা··· যুদ্ধ বলো, আন্দোলন বলো, পড়া-শুনো বলো, নিষ্ঠা ও সাধনার দরকার ; প্রয়োজন কর্ত্তব্যজ্ঞানের। ···রাজনীতি করব ব'লে সবাই স্কুল-কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জেল খাট্‌লে দেশ স্বাধীন হবে না ; প্রথম দরকার হ'চ্ছে—শিক্ষা ও জ্ঞানের ; রাজনীতি হ'চ্ছে দাবাখেলার মতন : চালে ভুল হ'লেই বাণচাল হ'য়ে যাবে।

—বন্দীদের দিয়ে সান্ধ্যস্তোত্র গাওয়ানো হ'চ্ছে সম্মিলিতকণ্ঠে সম্রাটের দীর্ঘজীবন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তির প্রার্থনা জানিয়ে।

আট

—নাড়ির গতি খারাপ হ'য়ে আসতে লাগলো আবার, জ্বরটাও বেড়ে গেল হঠাৎ, বুকটা দুলে দুলে উঠতে লাগলো, সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে হেঁচকি উঠতে লাগলো ; সত্যব্রত জেলারকে খবর দিলে : তিনি ডেকে পাঠালেন জেলডাক্তারকে, ঘুমজড়িত চোখে বিরক্তভাবে এলেন জেলডাক্তার : ঢুকতে ঢুকতে ব'ললেন—দুপুরে ত' বেশ ভাল ছিল! হঠাৎ কি এমন হ'লো যে আমাকে···

রোগীর অবস্থা দেখে কিন্তু থম্‌কে গেলেন তিনি : মায়ের মাথার অবগুণ্ঠন খ'সে পড়েছে : চোখের দৃষ্টি শ্রীমন্তের মুখের ওপর স্থির-নিবদ্ধ ; টনটনে জ্ঞান আছে শ্রীমন্তের···কিন্তু ভিতরে

যেন অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে, চোখ দিয়ে উপচে প'ড়ছে জল : সত্যব্রত মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে দিচ্ছে ; সত্যব্রতর একখানা হাত আকুল আবেগে চেপে ধরলো শ্রীমন্ত, মায়ের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালো একবার জড়িতকণ্ঠে—চারিদিকে তাকিয়ে যেন ব'ললে—আমার দেশ !

—বুঝেছি, বুঝেছি শ্রীমন্ত-দা : তোমার সব অনুরোধ আমি পালন ক'রব।

—অনুরোধ ?···কিসের অনুরোধ ? পিছনে ফিরে তাকালেন ডাক্তার।

—দেশসেবার দেশভক্তির...মাকে দেখার !

ডাক্তার নিজের কাজে মন দিলেন : শেষ ঔষধ দেবার জন্য তৈরী হ'তে লাগলেন তিনি ; হাত ও পায়ের নীচে হাত দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে : খল নুড়িতে মকর-ধ্বজ মাড়তে লাগলেন তিনি : কেন জানি না তাঁরও মনটা ভারী হ'য়ে এলো ; রোগা দুর্ব্বল ফর্সা ছেলেটির প্রথম জেলে আসার দিন মনে পড়লো, মনে পড়লো তা'র আয়ত ভাষাময় দুটি চোখ। ডাক্তার মকরধ্বজ নিয়ে আগিয়ে এলেন।

মা আর্ত্তকণ্ঠে ব'ললেন—পারলেন না ডাক্তারবাবু? পারলেন না ধ'রে রাখতে ?

ডাক্তারের দু'টি চোখেও জল এলো ; প্রথম যখন শ্রীমন্তের যক্ষ্মা হ'য়েছে ব'লে তাঁর সন্দেহ হয়, তখনই তিনি জেলারকে, জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে, কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন তার শ্রম লাঘব করতে, তা'কে চেঞ্জে পাঠাতে অথবা ছেড়ে দিতে ; সরকার

ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেয়নি ; সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশও তুলে নেয়নি, ফলে এই পরিণতি দাঁড়িয়েছে।

মা হাত বাড়ালেন—দিন, আমার হাতে দিন ; এই হাতে ক'রে নেকড়ার তুলিতে ওকে দুধ খাইয়েছি, এই হাতে ও ভাত খেয়েছে ছেলেবয়সে, আজ এই হাতে ক'রে ওর মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে আমি বিষ দেবো !

সত্যব্রত ডাকলো—মাসিমা।

—বাবা ?

—ওকে একটু শান্তিতে যেতে দিন মাসিমা ; আপনি ভেঙ্গে পড়েছেন দেখলে শ্রীমন্তদা যে বড় কষ্ট পাবে।…জেলের ঘণ্টা বাজছে, এক…দুই - তিন ; মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে শেষ হ'য়ে এসেছে ; শুধু গলা মোমের ওপর একটি সরু পল্‌তে জ্বলছে… বাইরের আকাশে ভোরের আসন্নতার আভাষ…

মকরধ্বজ খেয়ে শ্রীমন্ত যেন স্থির হ'লো ঃ তার যন্ত্রণা ক'মে গেল হঠাৎ ; কিছুক্ষণ নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়ে থাকলো ঃ নিস্তব্ধ ঘরে ঘড়িটা একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ করছে ; ওপারে কঠিন শাস্তি পাওয়া কয়েদীর "সেলে" পায়ের বেড়ি বাজছে ; হেঁচকি উঠলো বারকয়েক ঃ কস্‌ বেয়ে কয়েক ঝলক রক্ত উঠলো ঃ বালিস থেকে মাথাটা একপাশে হেলে প'ড়লো ঃ মা তখনও স্থির হ'য়ে ব'সে আছেন।

তের

…শ্মশান থেকে ফিরে সত্যব্রত দেখলে, মা কুটীরের দরজায় ম্লানমুখে ব'সে আছেন। কোনও রকমে-মুখাগ্নি করিয়েই মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল শ্রীমন্ত : মা কিন্তু অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়েছিলেন, মুখাগ্নি করার সময় ধীর অকম্পিতকণ্ঠে বলেছিলেন—দেশের জন্যে তুমি প্রাণ দিয়েছ, তাই তোমাকে হারানোর বেদনা ছাড়া মনে কোনও ক্ষোভ নেই আমার : তুমি যে দেশে গেছ, সেখানে শাসন নেই, পরাধীনতা নেই…চিরশান্তি সেখানে বিরাজ করে; তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!

—ফুলের মালা চন্দনে সাজিয়ে দিয়েছিল মৃতদেহ, যত যুবকের দল; জেলের গেট থেকে প্রসেশন ক'রে "বন্দেমাতরম্" গান করতে করতে শ্মশান পর্য্যন্ত ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিল মৃতদেহ; মফঃস্বল সহরটির এক ধনী দেশভক্ত ব্যবসায়ী শবদাহের জন্যে চন্দনকাঠ ও একটিন ঘি দিয়েছিলেন; মা মনে মনে দীর্ঘজীবন কামনা করেছিলেন দেশের তরুণদের, হৃদয়বান্ ব্যবসায়ীর!

সত্যব্রত যখন ফিরে এলো, তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সত্যব্রত ডাকলো—মা!—আর সে 'মাসিমা' বলবে না।

—কে শ্রীমন্ত! চম্‌কে উঠলেন মা, অবিকল তাঁর শ্রীমন্তের কণ্ঠস্বরের আহ্বান শুনে; পরমুহূর্ত্তেই নিজের ভূল বুঝতে পেরে কেঁদে ফেললেন হু হু করে—দেখো দেখি কী পোড়া মন আমার : তাকে যে নদী গর্ভে বিদায় দিয়ে এসেছি একথা মনেই ছিল না।

সত্যব্রত মায়ের কোল ঘেঁসে বসলো ঃ তার দুচোখে তখন ধারা নেমে এসেছে। হৈমবতী সত্যব্রতের মাথাটি কোলের ওপর টেনে নিলেন—এই দেখ পাগল ছেলের কাণ্ড! কান্নার ত' কিছু নেই বাবা! দেশের কাজে প্রাণ দিতে যারা পারে, তারা ভাগ্যবান, তারা দেবদূত ; পৃথিবী কি তাদের আটকে রাখতে পারবে ?

সত্যব্রত বললে—মা! শ্রীমন্তদা তোমার ভার ও তার অসমাপ্ত কাজের ভার আমার ওপর দিয়ে গেছে মা। কাল থেকেই আমাকে কাজে লাগতে হবে ঃ তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দিও।

—প্রথম কি কাজ করতে চাও বল!

—একটা আশ্রম খুলবো এই কুঁড়েতেই, এ সহরের ছেলেদের নিয়ে ঃ এর নাম থাক্‌বে "মাতৃ-আশ্রম" তুমি হবে তার নেত্রী ঃ বেশ হবে, না-মা ?

মা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ, তাই হবে। কি কি আদর্শ, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এ আশ্রম গড়বে বাবা ?

—এখানে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণকে লেখা-পড়া শেখান হবে, তক্‌লিতে সূতো কাটা, কাপড় বোনা, ঝুড়ি তৈরী, বেতের কাজ এই সব শেখানো হবে, আরও কত কাজ হবে ক্রমশঃ—

দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে লাল গোলাকার চাঁদ উঠছে, পূর্ণিমার চাঁদ ; অন্ধকার দূর হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী।

চৌদ্দ

আশ্রমের কাজ সুরু হ'য়ে গেছে, অশিক্ষিতদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার বই, সেলেট, পেন্সিল এসেছে, চরকা এসেছে চারটি, ঝুড়ি বোনার জন্যে, বেতের কাজ করার জন্যে এসেছে যন্ত্রপাতি: চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে মাথায় একটা গান্ধীটুপি প'রে গলায় একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে চাঁদা আদায় ক'রে ফেরে সত্যব্রত, কয়েকজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের নবনীর মত চেহারা, বালক বয়স ও কর্ম্মদক্ষতা দেখে সকলে যথাসাধ্য চাঁদা দেন; সত্যব্রত প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলে, মাতৃআশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য; তার মধ্যে রাজদ্রোহিতার, বিপ্লবের এতটুকু চিহ্নমাত্র ছিল না: কিন্তু সরকার পক্ষ তা মানলো না; রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে চরিদিক থেকে আশ্রম ঘিরে ফেললে পুলিশ; মা ও সত্যব্রত বাইরে উঠনে এসে দাঁড়ালেন, আর দাঁড়ালো আশে পাশের কুঁড়েঘরের ধাঙড়, মুচি, বাউরী ও মুদ্দোফরাসের দল; লাঠি সড়কি নিয়েই বেরিয়েছিল তারা: মা বললেন—ছিঃ বাবা! ওঁরা নিজের কাজ করতে এসেছেন; এই ওঁদের চাকরি…ওঁরা খানাতল্লাসী করবেন, করতে দাও, ওঁদের ওপর আমাদের কোন রাগ বা আক্রোশ নেই।

কালসাপ যেমন ফণা তুলেই সাপুড়ের জড়ির স্পর্শে মাথা নীচু ক'রে চুবড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, অশিক্ষিত মুচি মুদ্দোফরাস ও বাউরীর দলও তেমনিভাবেই মায়ের আদেশ মাত্র ঘরে ঢুকে লাঠি সড়কি রেখে এলো।

পুলিশ সার্চ্চ করলো তন্ন তন্ন ক'রে; জিনিষপত্র ছড়িয়ে ভেঙ্গে তছ্‌নচ ক'রে; কতকগুলি টুকিটাকি দামী জিনিষও নিয়ে যেতে ভুললোনা; কিন্তু পাওয়া গেল না আপত্তিকর কিছুই, শুধু একখানা বিপ্লবের ইতিহাস ছাড়া; লাল বাঁধানো মলাট

দেওয়া একখানা বই, তার পাতায় বহু ব্যবহারের হস্তচিহ্ন আছে, কিন্তু স্বযত্নে রক্ষা করেছে কেউ এর অস্তিত্ব, তাই মলাটটি নূতনের মত ঝক্‌ঝক করছিল, লাল রক্তের মত মলাট : তার উপর সোণার জলে নাম লেখা—শ্রীমন্ত সেন।

—শ্রীমন্ত সেন কে ? দারোগা জিজ্ঞাসা করলে মাকে।

—আমার ছেলে !

—তাঁকে একবার দেখতে চাই !

মায়ের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ; বললেন—আপনাদের সরকার তা'কে বহুভাবেই দেখেছিলেন ; বুঝেছিলেন সে ভেঙ্গে গেলেও নুইবার ছেলে নয় ...তাই কষ্ট ও নির্য্যাতন দিয়ে দিয়ে কারাগারেই তা'র যক্ষ্মা ধরিয়ে দিয়েছিলেন ; জেলের ভেতরেই সে মারা গেছে তিনমাস আগে !—মায়ের চোখে যেন আগুন ছুটলো ঃ দারোগা তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিলে।

—আর এই ছোটলোক ব্যাটারা কে ?...আপনাদের জমিদারীর প্রজা নাকি ?

হৈমবতী ম্লান হাসলেন—ওরা আমার ছেলে, আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড ; ওদের দূরে সরিয়ে রেখেই আমরা শক্তিহীন কুঁজো মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে গেছি ঃ ছোটলোক ! হ্যাঁ, ওই নামেই ওদের গৌরব, মানুষের ভগবান্ ওদের মাঝখানেই বাস করছেন !

দারোগা দু'এক পা আগিয়ে বললেন, আমরা ডিউটি বাউণ্ড কিনা ঃ আপনার নাম ?

নির্ভীক দৃঢ়কণ্ঠে সত্যব্রত বললো—সত্যব্রত রায় ?

দারোগা নোটবুকে লিখতে লিখতে ব'ললে—পিতার নাম ?

—যোগেশচন্দ্র রায় !

সন্দিগ্ধভাবে চোখ তুলে দারোগা জিজ্ঞেস ক'রলে—কি করেন তিনি ?

—সরকারী চাকুরি করেন ঃ জেলডাক্তার !

—অ্যাঁ ! আমাদের যোগেশবাবুর ছেলে তুমি ! আগে ব'লতে হয়। সত্যব্রতকে ছেড়ে দিলে দারোগা ঃ ব'ললে—এ ব্যাটাদের তু'জনকে বেঁধে নিয়ে যাবো। সহরে যত চুরি, ডাকাতি, খুন এই ব্যাটারাই করে ! লাঠি বের করেছিলো আবার শূয়োর কা বাচ্চা সব।

—খবরদার বাবু ! মুখ সামলে কথা বলবেন কিন্তু ! ভদ্দর-লোক ব'লে ছাড়ান পাবেন না, আমরাও মানুষ ঃ জানোয়ার ত' নাই !

পনেরো

ধাঙড় পল্লীতে পুলিশি জুলুম এবং অযথা কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়া নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লো প্রথমে ; পরে যখন তারা শুনলো, দারোগা থানায় গিয়ে মিথ্যে মামলা সাজিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও পুলিশের কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা-দানের অজুহাত দেখিয়ে তাদের চালান করার চেষ্টা করতে লাগলো, তখন দেখা দিল বিক্ষোভ। মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো তারা—তুমি মা লক্ষ্মী বিধেন কর এর ঃ নইলে আমরা আগুন জ্বেলে দেবো, কাজ বন্ধ ক'রে সহরকে তুদিনে নরক করে দেবো !

দারোগার রূঢ় কথাগুলি মনে পড়লো হৈমবতীর—আপনার জমিদারীর প্রজা ? ছোটলোক ব্যাটারা ; যারা হাতে করে মলমূত্র পরিষ্কার ক'রে ময়লা ঝাঁট দিয়ে সমস্ত গ্রাম, সহর ও নগরকে আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধ মুক্ত করছে, তা'রা আর যাই হ'ক ছোট লোক নয় ! ঘৃণা ও উপেক্ষা বুকে নিয়ে ওরা বেঁচে থাকে, পূজোর মন্দিরে ওদের প্রবেশ নিষেধ, সভ্যসমাজের কাছে ওরা অস্পৃশ্য ! ছোটলোক ! কিন্তু কালই যদি ওরা কাজ বন্ধ ক'রে দেয়, স্বর্গই নরক হ'য়ে দাঁড়াবে, বাসের অনুপযোগী হ'য়ে দাঁড়াবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে !

মা সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—বাবা ! অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ হয় না,—হিংসায় হিংসা বেড়ে যায় ; আজ যদি তোমরা আগুন জ্বালিয়ে দাও, সেই আগুন সমস্ত সহর গ্রাস ক'রে ফেলবে ; কিন্তু সেই সহর গ'ড়তে কত দিন, কত বৎসর, কত যুগ লেগেছে · কত মানুষকে খাটতে হয়েছে, একটির পর একটি ইঁট গাঁথতে হ'য়েছে ; কত মহাপুরুষের জন্ম হ'য়েছে এই মাটিতে, তোমাদের কত পূর্ব্বপুরুষ এই সহরের মাটিতেই মিশে আছে ঃ ওদের ওপর রাগ করে সহরে আগুন জ্বালানো বা নরক ক'রে তোলা কি ঠিক হবে বাবা ?

দু'একজন মাতব্বর ঘাড় নাড়লো—না, মা লক্ষ্মী মানা ক'রছেন ইকাজ কিছুতেই করব নাই হামরা—

'তোমরা কাজ ক'রে যাও যেমন করছ, সত্যব্রত ওপরে চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে ওদের ছাড়িয়ে আনবে, তোমরা লেখাপড়া শেখো, মানুষ নামের যোগ্য হও · আমি মা,

আশীর্ব্বাদ করছি তোমাদের দুঃখের দিন শীগগির কেটে যাবে!

ধাঙড়, বাউরী ও মুচিদের মেয়েরা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে উঠনে, হৈমবতী গীতা পড়ে গল্পের ছলে বোঝাবেন ওদের, বোঝাবেন দেশের মহীয়সী নারীদের কথা; প্রতিদিন ঠিক এমনি সময়ে ওরা আসে, মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যায় ধর্ম্মের কথা; সহজ ক'রে, মিষ্টি ক'রে ধীরে ধীরে ব'লে যান হৈমবতী, ওরা বুঝতে পারে: চোখ ছাপিয়ে জল আসে কখনো, কখনো প্রফুল্ল হাসিতে ভরে উঠে মুখ।

মা উঠে গিয়ে শাঁখ নিয়ে এসে বাজালেন: তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিলেন: তারপর মহাভারতখানা নিয়ে এসে ব'সলেন: তারা ঘিরে ব'সলো তার চারিপাশে।

ক্ষোভ

সত্যব্রতের স্কুলের কাজও ভাল চলছিল; সন্ধ্যের পর পাড়ার ধাঙড়, বাউরী ও মুচিদের ছোটবড় বেটাছেলেরা বই খাতা নিয়ে স্কুলে আসে, পড়ে, লেখে, অঙ্ক কসে, সূতো কাটে চরকায়, তাঁতে কাপড় বুনতে শেখে, মাঝে মাঝে দিনের বেলায় এসে বেতের বাঁশের ঝুড়ি বোনে তারা। কয়েক বছর ধ'রে ভাল ফসল হচ্ছিল না সারা জেলায়; অজন্মার আশঙ্কা দেখা দিতেই পড়াশুনার উৎসাহে ভাঁটার টান দেখা দিল যেন; সত্যব্রত ও তার সঙ্গীরা কারণ বুঝলো এর; ভাল ভাল দেখে

কৃষি বিষয়ক বই আনিয়ে ফেললো তারা ঃ নিজেদের বাড়ীর চারিপাশে পতিত জমির ওপর লাঙ্গল চাষ, মাটির চাক ভেঙ্গে জল সেচ ক'রে, সার দিয়ে তারা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলো ; উৎসাহী, কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান তরুণের হাতের স্পর্শে কাঁকুরে অনুর্ব্বর মাটিও যেন সজীব সবুজ হয়ে উঠলো ফসলে, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে আরও কত কি তরকারীও, সেইসঙ্গে কলাই বরবটি যে সময়ের যে ফসল ; তাদের সাফল্য আবার টেনে আনলো প্রতিবেশীদের ঃ তারা শিখতে চাইল জমিকে সজীব করার, উর্ব্বর করার কৌশল ; লেখাপড়া, সূতো কাটা, তাঁত বোনার সঙ্গে, কৃষিবিদ্যা এবং তার উন্নতির উপায়ও নির্দ্ধারণ করতে লাগলো তারা। বাগানের অদূরে প্রতিবেশী বাউরী, ধাওড় ও মুচিদের নিয়ে এরা কিছুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটা দীঘি কেটে ফেললো ; টলটলে স্বচ্ছ জল তার ! মানুষের চেষ্টা, মানুষের পরিশ্রম মানুষের সম্মিলিত শক্তিতে কী না হতে পারে জগতে ! মা দীঘির ধারে বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁচস্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে আছেন উদাস চোখে, শ্রীমন্তের চোখদুটো মনে পড়ে ; তার চোখও অমনি স্বচ্ছ ছিল, চোখের ভেতর দিয়ে নির্ম্মল অন্তরটি পর্য্যন্ত যেন দেখা যেত তার ! কখন সত্যব্রত এসে মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে, মা জানতে পারেননি, হঠাৎ পাশে ডাক শুনে ফিরে তাকালেন মা।

—কি বাবা ?

—কাল আমাদের এই দীঘির প্রতিষ্ঠা-উৎসব ; আমরা কয়েকদিন ধরে সহরের বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল, ডাল, তরকারী,

কাপড় ও টাকাকড়ি যোগাড় করেছি, তাই দিয়ে কালকের উৎসবে আমাদের প্রতিবেশীদের খাওয়ানো হবে।

—সেত' খুব ভালো কথা ; খুব আনন্দের কথা বাবা।

—আর আমাদের দীঘির কি নামকরণ করেছি জানো মা ?

মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ; সত্যব্রত ধীরে ধীরে বললে—শ্রীমন্তদীঘি : এর জল আশে পাশের এবং দূরাগতদের তেষ্টা মেটাবে, এর জল দিয়ে দরিদ্রনারায়ণের তৃষ্ণা-নিবারণ হবে, এর জল দেবতার মাথায় পড়বে—শ্রীমন্তদার স্মৃতি এর থেকে ভালো ক'রে আর কি করে রাখা যেত মা ?

—স্মৃতি ! মা হাসলেন, অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট হাসি ; তোকে যদি আমার অন্তরের ভেতরটা দেখাতে পারতাম ; তবে বুঝতিস স্মৃতি দগদগে হয়ে আছে এখনো।

সত্যব্রত চুপ করে থাকলো।

সতেরো

এমনি দিনে দীর্ঘ কারাবাসের পর জেল থেকে বেরিয়ে এলো গোলাম মহম্মদ, শ্রীমন্তের সহপাঠী বন্ধু ও সহকর্ম্মী এই মুসলমান ছেলেটিকে মা দেখে আসছেন ছেলেবেলা থেকে, যখন গ্রাম্য পাঠশালায় শ্রীমন্ত ও মহম্মদ একসঙ্গে পড়ত ; তাদের বন্ধুত্বের নিবিড়তা এত বেশী ছিল যে বাইরের লোকের দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, শ্রীমন্ত ও মহম্মদের মাঝখানে জাতিত্বের ব্যবধান আছে, হৈমবতীর কোলে বসে দুটী ছেলে একসঙ্গে মুড়ির মোয়া খেয়েছে, এই নিয়ে হৈমবতীকে গ্রাম্য সমাজের

কাছে কম জবাবদিহি করতে হয়নি; কিন্তু শ্রীমন্তের মা হৈমবতীর অন্তরটা কোমল হলেও তাঁর বাইরের চেহারায় এমন একটা গাম্ভীর্য্যের ও আভিজাত্যের বর্ম্ম ছিল, যার জন্যে কেউ তাঁর মুখের ওপর জোর করে কথা বলতে সাহস করত না; ব'লে বসলেও হৈমবতী এমন দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিতেন যে, অভিযোগকারীকে মাথা নীচু ক'রে ফিরে যেতে হ'ত।

গ্রামের সমাজের মাথা ষড়ানন শিরোমণি একদিন পিছনে দলবল নিয়ে দুপুরবেলায় অতর্কিতে হানা দিলেন হৈমবতীর কুটীরে: বারান্দায় বসে তিনি তখন রামায়ণ প'ড়ছেন, শ্রীমন্ত ও মহম্মদ মার্ব্বেল খেলছে উঠোনে; হঠাৎ ছায়া পড়ায় হৈমবতী চোখ তুলে তাকিয়ে ঘোমটাটা টেনে দিলেন; শিরোমণি একটু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—তোমার কাছে একটা বিশেষ কারণে এলাম বৌমা; তুমি হলে গিয়ে বিধবা মানুষ, একটু ধর্ম্মকর্ম্মে মতি রাখা তোমার উচিত নয় কি?

হৈমবতী বললেন—অধর্ম্মের কাজ কিছু করেছি বলে ত' মনে পড়ে না আমার!

শিরোমণি একটু ঢোঁক গিলে ব'ললেন—তা' নয়, তা' নয়, এই ব'লছিলাম মুসলমান ছেলেটির কথা, ওটাকে ঘরে আসতে দেওয়া, কোলে বসিয়ে খাওয়ানো লোকের চোখে ত' এগুলো ভাল ঠেকে না, যতই হ'ক বিজাতি!

হৈমবতীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল তিনি ব'ললেন—তাদের চোখে কি ভাল ঠেকে না ঠেকে তা' নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না, মহম্মদকে আমি পেটে না ধরলেও ও আমাকে মা

ব'লে ডাকে ; ও আমার ছেলে, শ্রীমন্তের ভাই ! ভবিষ্যতে ওর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে আসবেন না আপনারা !

সেই গোলাম মহম্মদ আজ একুশ বৎসরের যুবক ; শ্রীমন্তের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে, বিপ্লবের সৃষ্টি করার জন্যে তারও কারাবাস হয়েছিল ; দুটি বিভিন্ন জেলে দুজনকে বন্দী রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল ; জেল থেকে বেরিয়েই শ্রীমন্তের খবর নিতে এলো মহম্মদ ঃ গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দরের ধুতি, মাথায় খদ্দরের টুপি, দেখে চেনবার উপায় নেই মুসলমান ব'লে।

সত্যব্রত তাঁতের কাজ শেখাচ্ছিল বাউরী ও ধাঙড়দের ছেলেদের ; হঠাৎ অপরিচিত যুবককে আসতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো তার পানে ; আগন্তুক স্মিত হাস্যের সঙ্গে নমস্কার করে বললে—শ্রীমন্ত আছে ?

—না ! ধরা গলায় সত্যব্রত বললে।

—সে কি এখনো জেল থেকে খালাস হয়নি ?

—তিনি মুক্তি নিয়েছেন শুধু জেল থেকে নয়, পৃথিবী থেকে ; নিষ্ঠুর, নির্ম্মম নির্য্যাতনের হাত থেকে ; জেলের মধ্যে যক্ষ্মা হয়ে মারা গেছেন তিনি !

বাঁশের খুঁটিটা ধরে মাটীতে বসে পড়লো আগন্তুক ঃ চোখ দুটি ছাপিয়ে জল এলো তার ; মুখ ও চোখ মুছে নিয়ে ব'ললে—আমার মা আছেন ? শ্রীমন্তের মা ?

—হ্যাঁ তিনি আছেন ভেতরে !

—তাঁকে বলুন যে তাঁর আর একটি ছেলে গোলাম মহম্মদ

জেল থেকে ফিরে এসেছে! কথার মাঝখানেই মা এসে দাঁড়ালেন দাওয়ায়ঃ ম্লান হেসে বললেন—ফিরে এসেছ বাবা? ভগবান তোমার মঙ্গল করুনঃ কিন্তু সে ত নেই! মাকে প্রণাম করতে উঠে মায়ের পায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মহম্মদ। মা তাকে হাত ধ'রে তুলে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে বললেন, ওরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্, আমি মা হ'য়ে কি ক'রে তাকে ভুলে আছি! শুধু তোদের মুখ চেয়ে বাবা!

আশ্রমে

মা মহম্মদকে আশ্রমের ভিতরে নিয়ে গেলেনঃ চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল মহম্মদঃ সত্যব্রতের দিকে ফিরে ব'ললে···এ ক'বছরে আমাদের কুটীরটিকে যে আপনারা স্বর্গ ক'রে তুলেছেন!

সত্যব্রত ম্লান হাসলো—আমরা বিশেষ কিছু করিনিঃ আমাদের তথাকথিত নীচ জাতিরা তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এ আশ্রম গ'ড়ে তুলেছে।

মা ব'ললেন—তুমি সত্যব্রতকে আপনি বোলো না মহম্মদ, ও তোমাদের ছোট ভাই, শ্রীমন্তের মরণশয্যায় জেলের ভেতর ওকে পেয়েছিলাম; তা'কে হারানোর দুঃখ, ও আমাকে অনুভব করতে দেয়নি গভীরভাবে।

ভেতরের বারান্দায় সারবন্দী চরকায় সূতো কাটছে মেয়েরা, একপাশে কয়েকজন ঝুড়ি বুনছে, বেতের চুবড়ি তৈরী করছে;

সেইদিকে তাকিয়ে মা ব'ললেন—বাপ গোঁড়া সনাতনপন্থী, সরকারী 'চাকুরে', জেলের ডাক্তার···আর তাঁরই ছেলে সত্যব্রত, অন্তরে তা'র কোথায় বিদ্রোহ জমা ছিল, বিপ্লবের প্রতি আকর্ষণ ছিল, দেশের প্রতি হৃদয়ের টান ছিল, বুঝতে পারা যায়নি ঃ শ্রীমন্তের শেষ শয্যায় ও গিয়ে হঠাৎ দাঁড়ালো, ওর মধ্যে, ওর চোখে দেখলাম তোমাদের একই আদর্শ যেন খেলা করছে ঃ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমি, ও ফেরেনি। আর সত্যব্রত এই সেই গোলাম মহম্মদ, শ্রীমন্তের ভাই, আমার আর একটি ছেলে, এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম...।

শ্রীমন্ত-দীঘির জলে বাতাসের ছোঁয়ায় ঢেউ উঠছিল, ছোট ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউ ঃ মা, গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রত গিয়ে দাঁড়ালো দীঘির ধারে ; বিস্মিত চোখে তাকিয়ে মহম্মদ জিজ্ঞেস ক'রলো—এ পুকুর কাটলো কবে,···যাবার সময় ত' দেখে যাইনি !

মা সত্যব্রত্যক দেখিয়ে বললেন—এই ছেলেটির প্রেরণায় ঐ কুটীরবাসী অস্পৃশ্যেরা এ দীঘি কেটেছে, ওদের তৃষ্ণা মিটেছে এর জলে, আমার সন্তানহারা অন্তরের জ্বালা শীতল করেছে এই দীঘির জল, সত্যব্রত এ দীঘির নামকরণ করেছে তার নামে—শ্রীমন্ত-দীঘি ! মহম্মদের চোখে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়লো ঃ মনে হ'লো সে আর শ্রীমন্ত যেমন একই মায়ের কোলে ব'সে খেয়ে প'রে মানুষ হ'য়েছে, ওপারে হয়ত শ্রীমন্তকে তেমনি মুসলমানের আল্লা ও হিন্দুর ভগবান পাশাপাশি ব'সে তাকে কোলে টেনে নিয়েছেন।

উনিশ

বাংলায় একটা কথা আছে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা," তেমনি একবার পুলিশের সুনজরে প'ড়লে আর রক্ষা নেই; ছলে, বলে, কৌশলে ওরা তাদের কার্য্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করবেই। দিনকয়েক পূর্ব্বে "মাতৃ-আশ্রম" থানাতল্লাসী ক'রে পুলিশ আপত্তিকর কিছুই পায়নি। শুধু একখানা "বিপ্লবের ইতিহাস" পেয়েছিল, যার ওপর সরকারের বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু সে বইয়ের মালিক শ্রীমন্ত সেন সরকারের রক্তচক্ষু ও শাসনের নাগপাশ ছিন্ন ক'রে, তার তিনমাস পূর্ব্বে ওপারে পাড়ি দিয়েছিলেন, কাজেই তার বিরুদ্ধে মামলা খাড়া ক'রে, জুলুম ক'রে কার্য্য সিদ্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি।... সেইসঙ্গে আর একটি ছেলের নাম সরকারী থানার খাতাপত্রে লেখা ছিল, সত্যব্রত রায়ঃ দারোগা কেন যে তাকে 'বেনিফিট্ অফ্ ডাউট' বলে ছেড়ে দিয়েছিলো, নূতন দারোগা থানার চার্জ্জ নিয়ে তার কোনও হদিশই করতে পারলে না। উপরন্তু তার মনে একটা সন্দেহ জাগলো, হয়ত ঐ লোকটির কাছ থেকে পূর্ব্বতন দারোগা মোটা টাকা পকেটস্থ করেছিলোঃ চেষ্টা করলে সেই সত্যব্রত রায়কে পুনরায় গ্রেপ্তার ক'রে কিছু টাকা পকেটস্থ ক'রেও পদোন্নতি ক'রে নেওয়ার ক্ষীণ আশা তার অন্তরে জাগলো। নূতন দারোগা পরদিনই তৈরী হ'য়ে নিলে। মফঃস্বল সহরে এ ধরণের কেস্ সচরাচর পাওয়া যায় না, বিপ্লবী ও রাজদ্রোহীদের ধরিয়ে দিয়ে কারারুদ্ধ করতে পারলে প্রমোশনের

আশু সম্ভাবনা! দারোগা পুনরায় খাতা ওল্টালো, ঠিকানা নিতে গিয়ে তার দৃষ্টি একটি নামের ওপর নিবদ্ধ হয়ে গেল, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায়...আমাদের এখানের জেলডাক্তার বাবু নাকি? আসামী সত্যব্রতের পিতার নাম প'ড়ে তার মনে দ্বিধা জাগলো,...জেল ডাক্তার বাবু তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়।

পরক্ষণে মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিলে: স্থির করে নিলে সরকারী খাতায় অকপটে লিখে দেবে তার নিকট-আত্মীয়ের এবং সরকারী চাকুরের ছেলে সত্যব্রতকে বিপ্লবী ও রাজদ্রোহী জেনে কর্ত্তব্যের অনুরোধে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হ'য়েছে!

ভোর রাত্রে "মাতৃ আশ্রম" পুনরায় ঘিরে ফেললো পুলিশ। গাছে গাছে কাক পাখীরা জেগে উঠে সাড়া জাগালো। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছিল প্রভাতের আবির্ভাবে। ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গতেই সত্যব্রতের, জানলাটা খুলতেই ঘুম ভাঙ্গা চোখ মেলে সে দেখ্‌লো বাইরে সারবন্দী পুলিশ আশ্রম ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

কুড়ি

আর এক দফা নূতন ক'রে সার্চ্চ ক'রলো পুলিশ, সমস্ত আশ্রম তন্ন তন্ন ক'রে ঘেঁটে তছ্‌নছ্‌ ক'রে ফেললো। সত্য-ব্রতের ঘরটিতে সত্যব্রতের পাশের বিছানায় রাত্রে ঘুমিয়েছিল মহম্মদ। তাকে সতর্ক ক'রে দেবার সময়ও পায়নি সত্যব্রত, যখন তাকে উঠিয়েছিল, পুলিশ তখন খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে সতর্ক চোখে ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে, একদল ভেতরে ঢুকেছে: দু'জনকে সত্যব্রতের ঘরে মোতায়েন রেখে

বাকী ঘরগুলি সার্চ্চ ক'রলো দারোগা। অবশেষে এই ঘরটি সার্চ্চ করতে ঢুকলো, এঁদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিলে একবার....সত্যব্রতের বিছানাটা তক্তা থেকে মাটিতে ফেললে ছুঁড়ে। আপত্তিকর কিছু না পেয়ে যেন ক্ষেপে গিয়েছিলো সে, হঠাৎ পাশের বিছানা তুলতে গিয়ে যেন সাপ দেখে ছিট্‌কে গিয়ে কৌশলী সাপুড়ের মত এগিয়ে এলো। বালিশের ফাঁক দিয়ে একটি রিভল্‌ভারের নল চক্‌ চক্‌ ক'রে উঠলো! সেটা তুলে নিলে দারোগা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো···তারপর চোখ তুলে সত্যব্রত ও মহম্মদের পানে তাকালো।

মহম্মদ ধীর অকম্পিত কণ্ঠে ব'ললে—এ রিভল্‌ভার আমার।

—লাইসেন্স আছে, এর?

—না, এটা আমার আত্মরক্ষার জিনিষ, নিজস্ব অধিকারে রেখেছি। আমি পরশু জেল থেকে বেরিয়েছি, কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছি, এ রিভল্‌ভারের সঙ্গে, মালিকের সঙ্গে এ আশ্রম-বাসীদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাকে অ্যারেষ্ট করুন!

সত্যব্রত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। কখন মা এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পায়নি। মায়ের চোখে গালে জলের রেখা দেখে সত্যব্রত ও মহম্মদ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, শ্রীমন্ত মরার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখেনি। আজ তিনি কাঁদছেন কিসের বেদনায়?

সত্যব্রত ভাবলো দীর্ঘ কারাবাসের পর তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্র মহম্মদকে ফিরে পেয়ে তাকে আবার হারানোর আশঙ্কায় মা কাঁদছেন!

মহম্মদ ভাবলো অহিংস অসহযোগের কর্ম্মী আমি, দেশসেবা আমার ধর্ম্ম। আমার হাতে নরহত্যার অস্ত্র দেখেই কি মায়ের প্রাণে বেদনা বেজেছে ?

হঠাৎ সকলকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত ক'রে দিয়ে দৃপ্তভঙ্গীতে সত্যব্রত আগিয়ে এলো : ব'ললে, যে যাই বলুক দারোগাবাবু! এ রিভল্‌বার আমার। আমি আত্মসমর্পণ করছি, ছেলে মানুষ হ'লেও আমি বিপ্লবী!

দারোগা কিন্তু কোনও কথাই শুনলোনা, দুজনকেই গ্রেপ্তার করলো।

প্রতিবেশী মুচি মুদ্দোফরাস ও ধাঙড়রা লাঠি সড়কি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে আবার : পুলিশের হাতেও দুটি বন্দুক! প্রতিবেশীরা মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে লাগলো—তুমি হুকুম দাওনা একবার : তারপর একবার দেখে নিই, কেমন উয়ারা দাদাবাবুদের ধরে নিয়ে যায়, আর উহাদের বন্দুকে কত গুলি আছে!

মা এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন, পুলিশ ও প্রতিবেশীদের, উভয় দলই প্রস্তুত : মা বললেন—যদি শক্তির পরীক্ষা করতে হয়, তবে মাকে বধ করে তোমাদের শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে আগে : পারবে তোমরা ?

লাঠি ও সড়কি হাতে মাথা নীচু করে তারা নিজেদের ঘরের ভিতর চলে গেল। গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। মায়ের চোখে যেন সমস্ত পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেছে।

একুশ

বিচার চলছিল ঃ জেলডাক্তারের ডাক প'ড়লো তাঁর ছেলের কাজের জবাবদিহি করতে, তাঁর সন্তানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে! চাকরির বন্ধন ও স্নেহ নিয়ে টানাটানি চললো জেল ডাক্তারের অন্তরে ঃ পুরু চশমার কাঁচের ভিতরে চোখ দুটি বার বার জলে ভরে উঠতে লাগলো, অবচেতন পিতৃহৃদয়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসার বেদনা!

বিচারক প্রশ্ন করলেন—সরকারপক্ষ থেকে আপনার ছেলের ওপর নজর রাখবার আদেশ হয়েছিল আপনার ওপরে?

জেলডাক্তার ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ। প্রায় তিরিশ বছর তিনি বিভিন্ন জেলে ডাক্তারী করেছেন ঃ কত জেলে হত্যাকাণ্ডের বন্দীদের অনশনের সাক্ষী দিতে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে ; এ কাজে তাই আর তাঁর ভয় হয় না।

উকিল প্রশ্ন করলেন—নজর রাখেননি কেন?

—নজর ঠিকই রেখেছিলাম ঃ—অকম্পিত গলায় ডাক্তার বললেন—দেখলাম সে যে পথে চলেছে, সেই ঠিক পথ, ন্যায়ের পথ! আদর্শ পথ!

বিচারক, উকিল থেকে সমস্ত বিচারকক্ষ উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল ঃ সকলের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে! গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রত অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকলো। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্যব্রত বলতে গেল—আমি যা করেছি নিজের দায়িত্বে—

হাত তুলে বিচারক তাকে থামিয়ে দিলেন ঃ তারপর জেল ডাক্তারকে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তবে কি আপনি বলতে চান, আপনার ছেলে যা করেছে খুব ভালো কাজ করেছে, এবং এতে আপনার সমর্থন আছে ?

জেল ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ তাই ঃ আমি অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি দেশের এমনি ছেলেদের ! তিরিশ বছর বিভিন্ন জেলে চাকরি করা হ'য়ে গেল আমার,....বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগলো—যেদিন থেকে রাজবন্দীরা জেলে আসতে সুরু করেছে, সেদিন থেকে তা'দের শ্লোপয়সনিং ক'রে শক্তিহীন ক'রে তোলা ; অসুখের সময় ভাল ওষুধ না দিতে দেওয়া, মুমূর্ষু রাজবন্দীদের শরীরে মরফিয়া ইনজেক্ট ক'রে তাকে বধ করা, সবই আমার হাত দিয়ে সরকার করিয়ে নিয়েছেন ! নিজের দেশে, স্বাধীনভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না ! মানুষ হ'য়ে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং দেশের যে সব ছেলে, দেশবাসীকে সেই অধিকার এনে দেবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে, তা'রা হবে রাজদ্রোহী ! বিপ্লবী ! এ কি রকম আইন !” বিচারক নোট করছিলেন, সাক্ষীর জবানবন্দী ঃ হঠাৎ মাথা তুলে বললেন—জানেন, এর থেকে আপনার কি হ'তে পারে ?—জানি বৈকি ! সরকারের অধীনে দীর্ঘদিন চাকরি ক'রে সেটুকু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ; হয়ত সরকার আমার পেনসন বন্ধ করে দেবেন, জুলুম করবেন পুলিশ লাগিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করবেন। যে কারাগারে আমার হাতের ছুঁচের বিষ দেশের ছেলেদের মেরেছে, সেই কারাগারে মরতে পেলেই আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে !

বাইশ

দীর্ঘ মেয়াদে সাজা হ'য়ে গেল সত্যব্রত ও গোলাম মহম্মদের! "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে তাদের জেলের গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে অগণিত জনতা; ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গে এলেন; আজ পরণে তাঁর কোট-প্যাণ্ট সাহেবী পোষাক নেই, ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর গায়ে দিয়ে তিনি সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, সেই পোষাকেই পায়ে হেঁটে এদের সঙ্গে জেলের গেট পর্য্যন্ত এলেন; নিকটেই তাঁর কোয়ার্টার;—বাড়ীর মেয়েরা সত্যব্রতকে ধ'রে আনতে দেখে কেঁদে উঠলো: ডাক্তার এগিয়ে গেলেন—ছিঃ! কি ক'রছ তোমরা! আজ কি কাঁদবার দিন, না এই কাঁদবার সময়! শাঁক বাজাও, ফুলের মালা আর চন্দন দিয়ে বরণ ক'রে ছেলেদের জেলে পাঠাও; ইংরেজের প্রত্যেকটি ইট, পাপের রক্ত মাখানো; শীগ্‌গির জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে কোয়ার্টার ছেড়ে এসে বাইরে দাঁড়াও!

সত্যব্রতের কাছে আগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—দিদি কোথায় আছেন রে সত্য?

—মা? মা আছেন মাতৃ-আশ্রমে: তুমি তাঁকে দেখো বাবা!

—দেখবো নারে, তা আবার দেখবো না! তোর এ বুড়ো বাপের চোখ কে খুলে দিলে বল্ দেখি?—ঐ দিদি, তোদের সকলের মা।—আমি যে সকলকে নিয়ে ওখানেই গিয়ে উঠছি:

আমার যা কিছু সঞ্চয় আছে সারাজীবনের, তোদের মাতৃ-আশ্রমের কাজে লাগাবো।

গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রত প্রণাম ক'রলো তাঁকে।

এমন সময় লাল কাঁকরে পথের উপর দিয়ে জেলখানা অভিমুখে একটি ফিটন গাড়ী আস্তে দেখা গেল ; তার পাদানীতে ও কোচবাক্সে চারটি তথাকথিত অস্পৃশ্য লোক, যেন দেশমাতা তাঁর অনাদৃত, উপেক্ষিত সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গাড়ী থেকে এসে নামলেন ; মা নেমে এলেন গাড়ী থেকে : বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না, তাঁর অন্তরে ঝড় বইছিল তখন ; ধীর কণ্ঠে বললেন—আশীর্ব্বাদ করতে এলাম তোদের ; জেলে যাবার আগে একবার চোখের দেখা দেখতে এলাম ; কতদিন দেখতে পাবোনা কে জানে !

সত্যব্রত বলতে গেল—আমার বাবা......

মা থামিয়ে দিয়ে বললেন—হাঁ শুনেছি সব : ওঁর এই পরিণতিই আশা করেছিলাম বাবা ! তোরা ত ওঁকে চিনতে পারলিনে,......বাইরেটাই দেখলি, অন্তরটা যে ওর কত কোমল, শ্রীমন্তের অসুখের সময় আমি তা দেখেছি !

তেইশ

গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রতের জেল হওয়ায় দু'দিন পরে "মাতৃ-আশ্রমের" দরজায় দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়ালো জিনিষপত্র ও মেয়েছেলে বোঝাই হয়ে ; গাড়ী থেকে প্রথমেই জেলডাক্তার, উঠোনে এসে ডাকলেন—দিদি কোথায় গো ?

—এই যে ভাই, আসুন!

—সকলকে নিয়ে তোমার আশ্রয়েই চলে এলাম: ক'দিন আর বাঁচবো তার ত স্থির নেই, বয়স হয়েছে...ছেলেমেয়েদের ত আর মানুষ করে যেতে পারবো না; সে ভার তোমার ওপরই দিয়ে যাবো দিদি!

সত্যব্রতের মা ও ভাইবোনেরাও এসে দাঁড়ালো তাঁর পিছনে; সকলকে ভিতরে নিয়ে গেলেন হৈমবতী; আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন তাঁদের সকলকে: বললেন—এ ত বড় সৌভাগ্যের কথা ভাই। দেশের কাজের জন্যে এতগুলো ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? তাছাড়া ছেলে দুটি আমার জেলে গেল,··· ওদের কাজ দেখবার জন্যেও ত লোকের দরকার।

—সব মোহ কাটিয়ে চলে এলাম দিদি: ও পাপের পয়সা আর দরকার নেই; পেনসন বন্ধ ক'রে দিলে ওরা, দিক্: আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আর নিজের সঞ্চয়ের টাকাগুলি তোমাকে দিচ্ছি, দেশের কাজে, এই মাতৃ-আশ্রমের উন্নতির কাজে লাগিয়ো;···এখানে দেশের যত অস্পৃশ্যদের, যত অনাদৃতদের, দরিদ্রনারায়ণদের তুমি চোখ খুলে দেওয়ার, মানুষ করার দায়িত্বভার নিয়েছ, একথা শুনে বড় আনন্দ হয়েছে দিদি।

জেলডাক্তারের প্রতি সরকারের কোপ, তাঁর পেনসন বন্ধ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল না; তিনি "মাতৃ-মন্দিরে" আসবার কয়েকদিন পরেই বিপ্লবীদল ও অসহযোগ কংগ্রেস আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল:

তিরিশ বছরের রাজভক্তির পুরস্কার হ'ল তাঁর রাজদণ্ড, রাজ-প্রতিনিধি, বিচারকের বিচারে চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল তাঁর! ডাক্তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনও উকিল পর্য্যন্ত দিলেন না; স্থানীয় ছেলেরা তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল; তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন—না বাবা, এটা আমার রাজভক্তির নায্য পুরস্কার।

ছব্বিশ

... পঞ্চান্ন বৎসরের যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর শক্তির শেষবিন্দু সরকারী কাজে নিয়োজিত করেছিলেন: আজ সেই সরকারেরই শাসনের শৃঙ্খল প'রে তিনি কারারুদ্ধ হলেন: তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হতে লাগলো জেলে; গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রত তাঁকে সাহায্য করতে এলে কারা-রক্ষীরা বাধা দিত; মাঝে মাঝে এসে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলতেন—ক্ষমা, চেয়ে নিন। ডাক্তারবাবু, তিরিশ বছর কাজ করেছেন সরকারের অধীনে,......আপনার সাজা মকুব হয়ে যাবে। দন্তহীন মুখে প্রাক্তন জেলডাক্তার হাসেন........দু'হাতে দুটি জলভর্ত্তি বালতি নিয়ে জেলের পোষাকে বৃদ্ধকে অপূর্ব্ব দেখায়: তিনি যেন কোন অদৃশ্যলোক থেকে অফুরন্ত শক্তি সঞ্চয় করেছেন।

হেসে তিনি বললেন—ক্ষমা চাইবো কার কাছে? অন্যায় ত করিনি; বরং তাঁরাই আমাকে দিয়ে অনেক অন্যায় করিয়ে

নিয়েছেন........দেশের অনেক তরুণ যুবককে হত্যা করিয়েছেন, সেকথা ভুলিনি আমি!

নিরুপায় ভাব দেখিয়ে জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন—তবে আমরাও নিরুপায়ঃ আমরাও ত হুকুমের চাকর!....পেটের দায় মশায়ঃ যা বলবে, তাই করতে হবে আমাদের। আপনাকে যে একটু কম খাটুনির কাজ দেবো, তার উপায় কি আছেঃ ওপর থেকে কড়া চিঠি এসেছে........লেট্ হিম্ রিপেণ্ট ফর্ হোয়াট্ হি হ্যাজ ডান্!

—অনুশোচনা কারাবাসের জন্যে মোটেই হয়নি, হবেও না, অনুশোচনা হয়েছে, যে সময়টা সরকারী চাকুরির মোহে ক্ষতি করে বসেছিলাম সেই সময়টার জন্যে, তখন থেকে যদি দেশের কাজ করতাম আজ দেশ কত আগিয়ে যেত বলুন দেখি!

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আগিয়ে যানঃ বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র বাগানের গাছে জল দিতে থাকেন, তরুণ ছোক্‌রা একটি ডাক্তার এসেছে তাঁর জায়গায়, বড় ভাল ছেলেঃ কত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে যোগেশবাবুকে, কত পরামর্শ নেয়ঃ তাঁকে রায় মহাশয় ব'লে ডাকে। ডাক্তারটি প্রায়ই এসে ছলছুতায় তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার অছিলায় তাঁকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দেয়, গল্প করেঃ বলে দেশের স্বাধীনতা কে চায় না বলুন, শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত; কিন্তু আপনার ছেলে সত্যব্রতের, গোলাম মহম্মদের এবং আপনার মতন দেশাত্মবোধ ক'জনের থাকে?—কিন্তু নতুন ডাক্তার একটু দ্বিধা করেন—আপনার হার্ট সাউণ্ড কয়েকদিন থেকে নর্ম্যাল পাচ্ছি না; কেমন যেন একটু র‍্যাপিড্

বিট্! আমি গভর্ণমেণ্টের কাছে রেকমেণ্ড করবো আপনার মুক্তির জন্যে!

ম্লান হেসে যোগেশচন্দ্র বলেন—কিছু ফল হবে না ভায়া, উপরন্তু তোমার উপরও রোখ চেপে যাবে গভর্ণমেণ্টের!

তরুণ ডাক্তারটি হতাশভাবে তাকিয়ে থাকেন।

পঁচিশ

যোগেশচন্দ্রের বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহ কারাবাসের ক্লেশ ও নির্য্যাতন বেশীদিন সহ্য করতে পারেনি; নতুন ডাক্তারের কথা সত্য হ'য়ে উঠে,...তাঁর হৃদরোগ দেখা দেয়; কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। গোলাম মহম্মদ ও সত্যব্রত তাঁর রোগশয্যার পাশে এসে বসে; জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁদের অনুমতি দেন যোগশচন্দ্রের সেবা ও পরিচর্য্যা করার। কোনও ওষুধে বিশেষ কাজ হয়নি, তাঁর অবস্থা দিন দিন আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর ছেলেমেয়েরা ও হৈমবতী তাঁর পাশে থাকবার অনুমতি ভিক্ষা করেন সরকারের কাছে, তাঁকে দেখে আসবার অনুমতি দেন তাঁরা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। তরুণ ডাক্তারটি তাঁর জন্যে বহু চেষ্টা করেন; যোগেশচন্দ্র ম্লান হাসেন—বৃথাই চেষ্টা করছ ভায়া···ছেঁদা বজরায় কি জল ধরে! ....আর কিন্তু কোনও দুঃখ নেই আমার; শেষে ক'দিন স্বদেশ ও জাতির সেবা করে যেতে পারলাম, ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে কারাক্লেশ ভোগ করলাম...বেশ কাটল!

সত্যব্রত ব'ললে, আপনার শেষজীবনে এই কষ্টের জন্মে আমিই অনেকাংশে দায়ী বাবা।

যোগেশচন্দ্র বুকটা চেপে ধরে হাসেন—নারে, তোদের শিক্ষা, তোদের আদর্শ অনেক বড় · আমাদের যুগের পর তোদের যুগের হাওয়া অনেক বদলেছে, তাই আমাদের যুগের মাপকাঠিতে তোদের কাজের বিচার করা ভুলই হ'য়েছিল আমার।···মনে পড়ে তোর,—দিদি একদিন এখানে বসেই এই কথা বলেছিলেন?—মহম্মদ! কাছে স'রে এস বাবা, তোমাকে ভাল ক'রে দেখিঃ তুমি শ্রীমন্তের বন্ধু; সরকারের আদেশে আমি শ্রীমন্তকে শ্লো পয়সনিং ক'রেছিলাম, জানো তুমি? তার মরণোন্মুখ অবস্থায় তার মৃত্যুকে আগিয়ে দিতে মরফিয়া ইন্‌জেক্‌সন্ করতে গিয়েছিলাম,...এ সত্যটা সত্যব্রত তোমার কাছে প্রকাশ করেনি। বুকটা চেপে ধ'রে উঠে ব'সতে চেষ্টা করলেন যোগেশচন্দ্র অস্থিরভাবে; উঠতে পারলেন না; বিছানার ওপর প'ড়ে গেলেন—'ওঃ', একটা আর্ত্তনাদ বেরুলো মুখ দিয়ে।

তরুণ ডাক্তার বললেন, এখনো সামান্য প্রাণ আছে রোগীর ঃ বলুন "বন্দেমাতরম্।" ঘুমিয়ে পড়লেন যোগেশচন্দ্র মহানিদ্রায়; সে ঘুম কি স্বাধীনতার শুভ দিনে? ওপারের পাশে দাঁড়িয়ে এপারের নব অরুণোদয় কি তিনি দেখতে পাবেন?

সমাপ্ত